সাম্যবাদ

'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'-এর মুখপত্র

১৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা | জানুয়ারি ২০২৫ | মূল্য ৫ টাকা

'জুলাই ঘোষণা' প্রসঙ্গে

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক সমাজের খসড়া ঘোষণাপত্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের দল বা জোটকে না দিলেও এটা ইতোমধ্যেই বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত। গত ১৬ জানুয়ারি সরকারের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক সর্বদলীয় বৈঠকে আমাদের দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং আরেকটি ঘোষণাপত্র পাঠানো হয়।

এই দুইটি ঘোষণার বেশকিছু অংশের সাথে আমরা একমত থাকলেও, এখানে বিভিন্ন বিষয়কে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে– সেটা অনেকক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ, বেশকিছু জায়গায় ভুল এবং খানিকটা বিভ্রান্তিকর বলে আমাদের মনে হয়েছে। এই দুইটি ঘোষণাপত্রের প্রধান কয়েকটি দিক নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা রাখতে চাই, যাতে এ সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে সত্যে উপনীত হওয়ার পথটি প্রশস্ত হয়। আমরা নিশ্চিত যে তারা এই বক্তব্যটি ভেবে দেখবেন। সময়াভাবে ও সকলের পড়ার সুবিধার্থে আমরা আমাদের আলোচনা বিস্তারিত না করে সংক্ষিপ্ত আকারে রাখব। পরবর্তীতে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত মতামত রাখতে পারি।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস প্রসঙ্গে

১৯৪৭ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র জনগণের দীর্ঘ সংগ্রামের একটা পর্যায় শেষ হয় এবং ১৪ আগস্ট স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তান মূলতঃ পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতি গোষ্ঠীর কাঁচামাল ও পুঁজি সংগ্রহের উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এ অঞ্চলের জনগণ চূড়ান্ত শোষণের শিকার হয়। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রায় ৬০% মানুষ পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী হলেও, এ অংশে ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৫৪-৫৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ ছিল মাত্র ২০%। এই নির্মম শোষণ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ নিরবে মেনে নেয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের উপর এই নির্মম শোষণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিরাট ভৌগলিক দূরত্ব এবং পাকিস্তানের দুই অংশের ভাষা ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ এই শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের রক্তস্নাত বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়– এই আন্দোলনগুলি মানুষের চিন্তার মধ্যে প্রথম স্বাধিকারের ধারণা নিয়ে আসে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী কর্মসূচীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সায়ত্বশাসনের একটা ধারণা মূর্ত হয়। উল্লেখ্য যে, শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে অসম্ভব জনপ্রিয় মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী এই পর্ব থেকে একটার পর একটা গণআন্দোলন সংগঠিত করেছেন, যা শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে পরিণতি লাভ করেছিল। কিন্তু ইতিহাসে উনার এই ভূমিকার কথা সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়নি। ১৯৭০ সালের ২০ ও ২১ নভেম্বর খুবই অসুস্থ অবস্থায় মওলানা ভাসানী ঘূর্ণিঝড়ে ও জলোচ্ছাসে বিধ্বস্ত এলাকা ঘুরে আসেন। ২৩ নভেম্বর পল্টনে তিনি এক ঐতিহাসিক জনসভায় বক্তব্য রাখেন। সে বক্তব্যের শেষে স্লোগান তুলেন, "স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ!" আবার ৩০ নভেম্বর 'জনগণের প্রতি মওলানা ভাসানীর ডাক' শীর্ষক এক প্রচারপত্রে তিনি আবেদন রাখেন, "পূর্ব পাকিস্তানের আজাদি রক্ষা ও মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন।" বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সম্ভবত এটাই প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি।

এরপর বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, সায়ত্বশাসনের দাবির ভিত্তিতে ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, সায়ত্বশাসন ও শ্রমিক-কৃষকদের মুক্তির দাবিসহ ১১ দফার ভিত্তিতে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান– এই ঘটনাগুলো পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। এর পরবর্তীতে ১৯৭০ সালের গণপরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় শুধুমাত্র একটা দলের নির্বাচনী বিজয় ছিল না। এটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু এই সকল আন্দোলনে বামপন্থীদের একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল।

৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

অগ্নিমূল্যের বাজারে নতুন করে ট্যাক্স আরোপ

শেখ হাসিনা পালিয়েছেন, কিন্তু তার অর্থনীতি বহাল আছে

১.

সকাল থেকে ঢাকার কালশী ফ্লাইওভারের নীচে টিসিবির দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন গৃহকর্মী লাইলী বেগম। তিন দিন ধরে তাঁর ঘরে রান্না করার মতো চাল নেই। যেসব বাসায় কাজ করেন, সেখান থেকে অল্প পরিমাণে চাল এনে তিনদিন রান্না করে খেয়েছেন তিনি। আজ তাও শেষ। তাই দাঁড়িয়েছেন লাইনে। টিসিবির ট্রাক থেকে চাল কিনতে পারলে, তবেই ঘরে রান্না হবে। বাসায় মা ও ছেলেকে নিয়ে থাকেন। চারটি বাসায় কাজ করে পান মাসে আট হাজার টাকা। এ টাকাতেই তিনজন মানুষের পুরো মাস চলতে হয়। ফলে সব কিছুর দাম বাড়ায় হিমশিম খাচ্ছেন। গত দেড় বছরে নিজের টাকায় কোনো মুরগি বা গরুর মাংস কিনতে পারেননি লাইলী বেগম। ফলে টিসিবি ও ওএমএসের ভর্তুকি মূল্যের পণ্য কিনতে পারলে কোনোমতে সংসার চালাতে পারেন। (সূত্র-৭ নভেম্বর, প্রথম আলো- টিসিবির ট্রাক থেকে চাল নিলে রান্না হবে লাইলী বেগমের ঘরে)।

২.

৭৫ বছরের গোলতাজ বেগম চট্টগ্রাম জামালখানে টিসিবির পন্য নেওয়ার জন্য দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়ানোয় ক্লান্ত। তাঁর স্বামী অসুস্থ। ছেলেও বেকার। কোনোরকমে টেনেটুনে সংসার চলছে। পরিবারের অবস্থা বর্ণনা করে তিনি বলেন, স্বামী ঘর-বসা। বেশ কিছুদিন ধরে কাজে যেতে পারছেন না। আয় নেই। মেয়ের এক জোড়া স্বর্ণের কানের দুল বন্ধক রেখে কিছু টাকা পেয়েছেন। সেই টাকা দিয়ে বাজার খরচ চলছে। সেখান থেকে কিছু টাকা নিয়ে টিসিবির পণ্য কিনলেন। (সূত্র- ৭ নভেম্বর, ২০২৪, প্রথম আলো, কানের দুল বন্ধক রেখে টিসিবির চাল-ডাল কিনলেন গোলতাজ বেগম)

৩.

আলু, পেঁয়াজ, চাল, সবজিসহ প্রায় সমস্ত খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে টিসিবির ট্রাকের লাইনে নিম্নবিত্তদের সাথে এখন মধ্যবিত্তদেরও দাঁড়াতে হচ্ছে। "টিসিবির পণ্য কেনার সারিতে আগে একসময় কেবল স্বল্প আয়ের মানুষের দেখা মিলত। এখন আগের পরিস্থিতি নেই। নগরের বিভিন্ন ট্রাক সেল পয়েন্টে গিয়ে অটোরিকশাচালক থেকে শুরু করে গৃহিণী, ক্ষুদ্র দোকানি, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্কুলশিক্ষকসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষের দেখা মিলছে। সারিতে থাকা ভোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তাঁদের প্রত্যেকেরই আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের হিসাব মিলছে না। আয়ের তুলনায় অন্তত পাঁচ হাজার টাকার ঘাটতি থাকে গড়ে। অধিকাংশই ঋণ করতে ও সঞ্চয় ভাঙতে বাধ্য হচ্ছেন। যাঁদের আয় ১৫-২৫ হাজারের মধ্যে, তাঁরা যেমন দুশ্চিন্তায় আছেন, তেমনি যাঁদের আয় ৩০-৪০ হাজারের ঘরে, তাঁদেরও একই দুশ্চিন্তা।" (২৯ নভেম্বর, প্রথম আলো)

৪.

এই যখন বাজারের পরিস্থিতি, তখন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মাঝপথে এসে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শতাধিক পণ্য ও সেবার ওপর মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক বাড়িয়েছে। রেস্তোরাঁ, মোবাইল বিল, ইন্টারনেট, রোগীর পথ্য নানারকম ফল (কমলা, আঙুর, আপেল, ডালিম, নাশপাতি) ও ফলের রস, বাদাম, চশমার ফ্রেম, চশমার গ্লাস, সান গ্লাস, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, বৈদ্যুতিক খুঁটি, রং, পোশাকের দোকান, মিষ্টির দোকান, বিস্কুট, জুস, ড্রিংক, ইলেকট্রোলাইট ড্রিংক, কেক, আচার, সস, সব ধরনের টিস্যু, ওষুধের ক্ষেত্রে স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে, আমদানি করা সাবান, ডিটারজেন্ট- এ সবকিছুতে ভ্যাট বেড়েছে।

যখন নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষ বাঁচার জন্য হাবুডুবু খাচ্ছে, তখন সাধারণ মানুষের নিত্যব্যবহার্য সেবার, পণ্যের বা পণ্যবিক্রির দোকানের উপর করবৃদ্ধিতে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। আইএমএফের পরামর্শে এই পরোক্ষ কর বাড়ানো হচ্ছে। অর্থাৎ শেখ হাসিনা পালালেও, শেখ হাসিনার অর্থনীতি ঠিকই আছে।

৫.

গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চারমাস পার হলো। সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা ছিলো, এবার জিনিসপত্রের দাম কমবে, অন্ততঃ বাড়বেনা। শেখ হাসিনা নেই, তার শাসনামলের ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠা সিন্ডিকেট এখন কেন থাকবে? এ প্রত্যাশাটাই স্বাভাবিক। কারণ বিগত ফ্যাসিবাদী শাসনে অর্থনীতিতে যে ভয়াবহ লুটপাটতন্ত্র তৈরি হয়েছিল, তার ফলে মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। ভোগ্যপণ্যের আমদানি হতে শুরু করে পুরো বাজার ছিল তাদের হাতে। সিন্ডিকেটই সরকার হয়ে উঠেছিল। মানুষ দেখেছে– চাল, চিনি, সয়াবিন তেল-পেঁয়াজসহ খাদ্যপণ্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে আওয়ামীলীগ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কিভাবে সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীরা হাজার হাজার কোটি টাকা জনগণের পকেট হতে লুটে নিয়েছে। আওয়ামীলীগ শাসনের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানে ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষের অংশ নেওয়ার অন্যতম কারণ ছিল এ অসহনীয় পরিস্থিতি। ফলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এ সিন্ডিকেট ভেঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করবে, এটাই ছিল সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা। কিন্তু গত চার মাসেও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। এর জন্য কি চার মাস পর্যাপ্ত সময় ছিলোনা?

৬.

বাজারের চিত্র কী? বর্তমানে শীতের সব্জী বাজারে আসায় শাকসব্জীর দাম কমেছে। কিন্তু একমাস আগেও কেজিপ্রতি আলু ৭৫-৮০ টাকা, দেশী পেঁয়াজ ১৩০ টাকা, ভারতের পেঁয়াজ ১০০ টাকা, চিনি ১৩৫-১৪০ টাকা ছিল। চালের দামও অনেক বেশি। নভেম্বরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১৪ শতাংশে ঠেকেছে।

সরকার বলছে, তারা দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে সরকার আলু আমদানির শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করে এবং ৩ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে। চালের দাম কমাতে গত অক্টোবরে দুই দফায় আমদানি শুল্ক সাড়ে ৬২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২ শতাংশে আনা হয়। এতে আমদানি খরচ কমেছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও খুলে দেয়া হয় আমদানির দুয়ার। কিন্তু চালের দাম কমেনি। (১৭ নভেম্বর ২০২৪, সিন্ডিকেটে এখন কারা?) পেঁয়াজ আমদানিতে প্রযোজ্য মোট করভার ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য শতাংশ করা হয়েছে। পেঁয়াজ আমদানির ক্ষেত্রে এখন আর কোনো ধরনের শুল্ক-কর থাকবে না। চিনি আমদানিতে শুল্ক-কর কমানো হয়েছে। তাতে প্রতি কেজি চিনিতে কমবেশি ১১ টাকা শুল্ক-কর কমেছে। আশা করা হয়েছিল, এর ফলে দেশের বাজারে পণ্যগুলোর সরবরাহ বাড়বে এবং দাম কমে আসবে। সরকারের

৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

সংস্কার কমিশনগুলোর কাছে ‘বাসদ (মার্কসবাদী)’ দলের প্রেরিত প্রস্তাবনা

জুলাই গণঅভ্যুত্থান সাম্প্রতিক সময়ে জাতির জীবনে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ঘটনা। ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারকে হটানোর জন্য যত দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও দীর্ঘদিনের লড়াই করতে হয়েছে, যে পরিমাণ রক্ত ঝরেছে– তাতে শুধু শেখ হাসিনার পতন নয়, বরং একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। এই বক্তব্য আন্দোলনকারীদের প্রায় সর্বমহল থেকেই সশব্দে উচ্চারিত হয়েছে ও হচ্ছে। এ কারণে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সংস্কারের আলোচনা সামনে এসেছে। বাস্তবে এটি অনেক আগে থেকেই আলোচনায় ছিল, কিন্তু এই সময়ে এর আবেদন ও বাস্তবতা আরও স্পষ্ট, আরও মূর্ত।

এরইমধ্যে রাষ্ট্রের সংস্কারের উদ্দেশ্যে দশটি সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে। সেখানে নিয়োগ পাওয়া অনেকের বিষয়ে প্রশ্ন থাকলেও বেশকিছু যোগ্য লোকও নিয়োগ পেয়েছেন, যাদের কাছে মানুষের প্রত্যাশা আছে। আমরা প্রত্যাশা করি, এই কমিশনগুলো যথাযথভাবে তাদের কাজ সম্পন্ন করবেন। তাদের প্রস্তাবনা সরকারের কাছে দেবেন এবং সরকারও দ্রুত এই খসড়া প্রস্তাবনাগুলো নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে আলোচনা শুরু করবেন। ৬টি সংস্কার কমিশনের কাছে খসড়া প্রস্তাবনা নিয়ে গত ১৩ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে ‘বাসদ (মার্কসবাদী)’-এর উদ্যোগে একটা সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনারে গণঅভ্যুত্থানে সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কিছু বিশিষ্টজন অংশগ্রহণ করেন ও মতামত রাখেন। এই সকল মতামতকে সংকলিত করে এই খসড়া প্রস্তাবনাকে চূড়ান্ত করা হয় এবং সংস্কার কমিশনগুলোতে প্রেরণ করা হয়। সংস্কার কমিশনগুলোতে প্রেরিত প্রস্তাবনাগুলো আমরা পাঠকের সামনে তুলে ধরছি।

সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাবনা

১. অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কাজের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি দেয়া। সংবিধানের তৃতীয়ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহকে শর্তের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করা। মৌলিক অধিকার পূরণে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা। মৌলিক অধিকার খর্ব হলে যে কোনো নাগরিক আইনের আশ্রয় নিতে পারবে– এমন বিধান সংবিধানে যুক্ত করা।

২. রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি লক্ষ্যে বিধান যুক্ত করা।

৩. সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করা।

৪. সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ সংস্কার করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের উপর প্রধানমন্ত্রীর অন্যায় হস্তক্ষেপেরসুযোগ বন্ধ করা।

৫. প্রধানমন্ত্রীকে অপসারন বা ইমপিচমেন্টের ব্যবস্থা রেখে সংবিধানের ৫৭ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা।

৬. সাংবিধানিক পদ ও প্রতিষ্ঠানগুলো যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সে জন্য সংবিধানের ৪৮ (রাষ্ট্রপতির নিয়োগ), ৬৪ (এটর্নি জেনারেলের নিয়োগ), ১২৭-১৩২ (মহাহিসাব নিরীক্ষকের নিয়োগ, দায়িত্ব, কর্মের মেয়াদ ইত্যাদি), ১৩৮-১৩৯ (সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য নিয়োগ, পদের মেয়াদ ইত্যাদি) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশ সংস্কার করা।

৭. সংবিধানে ঘোষিত স্থানীয় শাসনকে স্থানীয় সরকার হিসাবে অভিহিত করা। স্থানীয় সরকার যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা।

৮. সংবিধানে নির্বাচনকালীন সময়ের জন্য অন্তবর্তীকালীন বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার বিধান যুক্ত করা।

৯. বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচনব্যবস্থা চালু করা, যেন সত্যিকার অর্থেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয় এবং জনগণের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়। এজন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদ যুক্ত করা ও এর সাথে অসংগতিপূর্ণ অনুচ্ছেদসমূহ বাতিল করা।

১০. নির্বাচন কমিশন যেন স্বাধীনভাবে তার ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য সংবিধানের ৪৮ ও ১১৮–১২৬ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা।

১১. উচ্চ আদালত ও নিম্ন আদালতের উপর সরকার যেন অন্যায় হস্তক্ষেপ না করতে পারে সেজন্য সংবিধানের ৪৮, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১১৩, ১১৪, ১১৬ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুচ্ছেদের সংস্কার করা।

১২. পুলিশ বাহিনীর উপর প্রশাসন বা সরকারের অন্যায় প্রভাব বন্ধ ও স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ তৈরিতে সংবিধানের ৩৩ ও ৩৫ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা।

১৩. জাতীয় সম্পদ ব্যবহার ও আন্তর্জাতিক সকল চুক্তি জাতির সামনে উন্মুক্ত করা এবং এসকল চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সংসদে আলোচনা বাধ্যতামূলক করা।

১৪. পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীসহ অন্যান্য জাতিসত্ত্বার সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা। একইসাথে সংবিধানের ৬ ও ৯ নং ধারা সংস্কার করা।

১৫. সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে গৃহিত জরুরী অবস্থা জারি, সকল রকম মৌলিক অধিকার রহিত করার ক্ষমতা– অর্থাৎ নবম (ক) ভাগের ১৪১ এর (ক), (খ) ও (গ) ধারা বাতিল করতে হবে।

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাবনা

১. কমিশনের সাংবিধানিক মর্যাদা নিশ্চিত করা।

২. ‘দুদক আইন-২০০৪’, ‘দুদক বিধিমালা-২০০৭’ এবং ‘দুদক কর্মচারী বিধিমালা সংস্কার’ করতে হবে। বাছাই কমিটিকে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিতে হবে। বাছাই কমিটিকে রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে হবে।

৩. ‘দুদক আইন-২০০৪’ এর ৩৪ ধারা অনুযায়ী কোন বিধি প্রণয়ন করতে হলে দুদককে পূর্বেই রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিতে হয়। এই ধারা পরিবর্তন করে দুদককে স্বাধীনভাবে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা দিতে হবে।

৪. কমিশন গঠনে বাছাই কমিটির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। কমিশনার নিয়োগের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নসহ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে ও জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়ানো ক্ষেত্রে কী উদ্যোগ নেয়া যায় সেটা ভাবতে হবে। কারণ জনগণের আস্থা এই বিভাগের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এই বিভাগের উপর জনগণের আস্থা কতটুকু আছে– এজন্য নিয়মিত ভিত্তিতে জনমত যাচাইয়ের ব্যবস্থা রাখার বিধান প্রয়োজন।

৫. দুদকে প্রেষণ প্রথা বন্ধ করা।

৬. প্রতি বছর দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদ বিবরণী প্রকাশ করা।

৭. দুদকের অভ্যন্তরেও দুর্নীতি বিদ্যমান। সেজন্য দুদকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যক্রম মনিটরিংয়ে পৃথক সেল গঠন করা।

জনপ্রশাসন সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাবনা

১. ‘সিভিল সার্ভিস আইন ২০১৮’ বাতিল করে ‘সিভিল সার্ভিস আইন ২০১০’-এর খসড়া প্রস্তাবনার আধুনিকায়ন করে উক্ত আইনের বিধান অনুযায়ী প্রশাসনে নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদায়ন, পদোন্নতি অনুসরণ করা।

২. সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর যৌথ মতামতের ভিত্তিতে গঠিত উপযুক্ত সার্চ কমিটির মাধ্যমে সরকারি কর্ম কমিশনে (PSC) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ দেয়া। সরকারি কর্ম কমিশনের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা।

৩. যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততার ভিত্তিতে জনপ্রশাসনে লোকবল নিয়োগ করার চূড়ান্ত ক্ষমতা পিএসসিকে দেয়া।

৪. প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্ব নিশ্চিতকরণসহ নিয়োগ বাণিজ্যের অবসান ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠানসমূহকে সত্যিকারের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। জনপ্রশাসনকে দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত করা।

৫. প্রশাসন ক্যাডারের কর্ম বা পেশা, কাজের পরিধি ও আওতা সুনির্দিষ্ট করা।

৬. স্বচ্ছ, জটিলতামুক্ত, মেধানির্ভর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে জনপ্রশাসনে লোকবল নিয়োগের সার্বিক আয়োজনে পিএসসি দায়বদ্ধ থাকবে। যেখানে কোনো রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি বা প্রশাসনিক কর্মকর্তা, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ব্যক্তিবর্গের প্রভাব জনপ্রশাসন আইন বা সিভিল সার্ভিস আইন লঙ্ঘনের সমতুল্য হবে এবং এর জন্য দায়ী ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭. প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীকে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ইত্যাদি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পিএস/এপিএস হিসেবে নিয়োগ দেয়া বন্ধ করা।

৮. প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, সততা এবং যথাযথ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পদোন্নতির বিধান প্রণয়ন করে আইন করা।

৯. প্রজাতন্ত্রের নিয়মিত পদগুলোয় চুক্তিভিত্তিক স্থায়ী নিয়োগের বিধান রদ করা। অপরাধ নিরসনের জন্য ‘সিভিল সার্ভিস আইন ২০১৮’ সংশোধন করে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বন্ধ করা।

১০. জনপ্রশাসনে চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা নারী-পুরুষ, শারীরিকভাবে পঙ্গু, প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গ ভেদে ৩৫ বছর নির্ধারণ করতে হবে।

১১. সকল সরকারি দপ্তরের দুর্নীতি, অনিয়ম, অর্থ-কেলেঙ্কারি, অসদাচরণ রোধকল্পে একটি স্বতন্ত্র অভিযোগ কমিশন জেলায় জেলায় গঠন করা।

১২. আন্তঃক্যাডার বৈষম্য দূর করা। এজন্য জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্য হিসেবে প্রশাসনিক ছাড়াও অপরাপর অবসরপ্রাপ্ত ক্যাডারদের সদস্য হিসেবে যুক্ত করতে হবে।

৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

সাম্যবাদ
১৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২৫

পুলিশ বাহিনী সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাবনা

১. ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন বাতিল করে জনপ্রশাসন থেকে পুলিশ প্রশাসনকে পৃথক করা। পুলিশকে জনগণের উপর নিপীড়নকারী বাহিনীর পরিবর্তে জনগণের সেবার জন্য নিয়োজিত দক্ষ কর্মঠ বাহিনীতে রূপান্তর করা।
২. একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও যুগোপযোগী পুলিশ কমিশন তৈরি করা এবং এর মাধ্যমে পুলিশ বাহিনীকে পরিচালনা করা।এই পুলিশ কমিশন রাষ্ট্রের জনগণের সহযোগিতার জন্য নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীর নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতিসহ পেশাগত উৎকর্ষতা সাধনের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। পাশাপাশি পুলিশের বেতনসহ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করবে।
৩. পুলিশ বাহিনীর জবাবদিহি ও কাজের স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য জেলাভিত্তিক 'পুলিশ অভিযোগ কমিশন' গঠন করতে হবে, যেটি স্বাধীন পুলিশ কমিশনের অধীনে কাজ করবে।
৪. আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী, পুলিশের কর্মঘন্টা কমিয়ে ০৮ ঘন্টা করা এবং অতিরিক্ত কর্মঘন্টার জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করা। পুলিশের বিদ্যমান আবাসন সংকট দূর করা। ব্যারাকের পরিবেশ উন্নত করা।
৫. র‍্যাব ও শিল্প পুলিশ বিলুপ্ত করা।
৬. নিয়মিত পুলিশ বাহিনীকে দিয়ে জনপ্রতিনিধিদের প্রটোকল দেয়া যাবে না। জনপ্রতিনিধিদের প্রটোকলের জন্য প্রয়োজনে আলাদা ফোর্স গঠন করতে হবে।

নির্বাচন কমিশন সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাবনা

১. সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।
২. জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিরপেক্ষ তদারকি সরকারের অধীনে সংঘটিত করা।
৩. রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত স্বাধীন, নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন করা। এজন্য নির্বাচন কমিশন আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে।
৪. 'গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ' বা 'আরপিও' সংস্কার করা এবং আরপিওতে উল্লেখিত দল নিবন্ধনের অগণতান্ত্রিক শর্ত বাতিল করা।
৫. আরপিও-এর ৪৪(খ) সংশোধন করে পেশীশক্তি, প্রশাসনিক কারসাজি নির্ভর নির্বাচন আয়োজন বন্ধ করা। জামানতব্যবস্থা তুলে দেয়া।
৬. 'রিকল' বা প্রতিনিধি প্রত্যাহারের বিধান অর্ন্তভুক্ত করা।
৭. তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান নির্বাচন কমিশনের কাছে ন্যস্ত করা।
৮. প্রবাসীদের জন্য পোস্টাল ব্যালটের ব্যবস্থা করা।
৯. ঋণখেলাপী ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রার্থী হতে পারবে না।
১০. আরপিও এর ৯১(ক) ধারা বহাল করতে হবে।

বিচারবিভাগ সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাবনা

১. নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ নিশ্চিত করা।
২. বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংবিধানের পরিবর্তন নিশ্চিত করা।
৩. সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বিচারকদের স্বাধীনভাবে কাজের সুযোগ তৈরি করা।
৪. সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বিচারকদের নিয়োগের অধিকার সুপ্রিম কোর্টের হাতে ন্যস্ত করা।
৫. সংবিধানের ৪৯ ধারা অনুসারে সমস্তরকম বিচারকাজ সম্পন্ন করার পর উচ্চ আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর দণ্ডও রাষ্ট্রপতি মওকুফ করে দিতে পারেন। এটি বিচারব্যবস্থার ভারসাম্য নষ্ট করে ও এর ন্যায্যতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। এই বিধান বাতিল করে বিচারিক প্রক্রিয়াকেই সর্বোচ্চ স্থানে রাখা উচিত।
৬. উচ্চ আদালত ও নিম্ন আদালতে বিচারক নিয়োগে আইন বা নীতিমালা তৈরি করা।
৭. বিচারক নিয়োগ, পদোন্নতিসহ যাবতীয় কাজের জন্য সুপ্রিম কোর্টের অধীনে পৃথক সচিবালয় গঠন করা।
৮. মাসদার হোসেন মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের প্রদত্ত রায়ের পূর্ণ বাস্তবায়ন করা। সেই অনুসারে সুপ্রিম কোর্টের হাতে সমস্ত নিম্ন আদালতের নিয়ন্ত্রণ, স্বতন্ত্র জুডিশিয়াল পে স্কেল ও জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠন করা উচিত।
৯. বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হলেও তা নিজেই স্বেচ্ছাচারী ও দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যায়। এক্ষেত্রে কলেজিয়াম পদ্ধতি অনুসরন করে সিনিয়র প্রাজ্ঞ বিচারকবৃন্দের একটা প্যানেল তৈরি করা উচিত, যেটি বিচারকদের নিয়োগ, প্রত্যাহার ও বিচার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় তত্ত্বাবধান করবে। এটি বিচার বিভাগের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে।
১০. উচ্চ আদালত ও জেলা আদালতে সরকারি আইন কর্মকর্তাদের(জিপি/পিপি) নিয়োগ আইন মন্ত্রণালয়ের অধীন, যার ফলে দলীয় নিয়োগ হয়। সরকারি মামলা পরিচালনায় শৃঙ্খলা আনা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রবর্তন করতে হবে এবং জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে সরকারি আইন কর্মকর্তা (জিপি/পিপি) নিয়োগ করতে হবে।

১ম পৃষ্ঠার পর

'জুলাই ঘোষণা'

১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ এই গণআন্দোলনগুলোর স্বাভাবিক পরিণতি। এতে প্রায় সকল রাজনৈতিক দল ও লক্ষ-কোটি জনগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু এই গৌরব আওয়ামী লীগ একা আত্মসাৎ করতে গিয়ে এই মহান মুক্তিযুদ্ধকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এই মুক্তিযুদ্ধে জাতির একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ রাজাকার, আলবদর বাহিনী যেমন ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি লক্ষ-কোটি জনগণ অসীম সাহসিকতার সাথে লড়াই করে পাক বাহিনীকে প্রতিহত করেছে।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশের ঘটনাবলী মহান লেনিনের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়,"সাম্রাজ্যবাদের যুগে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত না হয়ে যদি বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়, তাহলে সে স্বাধীনতা হবে আধসেঁকা রুটির মতো।" লক্ষ লক্ষ মেহনতি মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের যে স্বাধীনতা অর্জিত হলো, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যাওয়ার ফলে ও সাম্রাজ্যবাদী স্তরে উত্তরণ হওয়ার ফলে এদেশে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র গঠিত হলো তা প্রথমদিন থেকেই শোষণ, জুলুম, অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারীতার দিকে পা বাড়ালো। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ এই চার বছরে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে একটার পর একটা জনবিরোধী নীতি রাষ্ট্র কার্যকরী করতে শুরু করে। সাংবাদিক ও বিরোধীদের ধরপাকড় ও হত্যা করতে শুরু করে। বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয় পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির নেতা সিরাজ সিকদারকে। জাসদের ৩০ হাজার কর্মীকে হত্যা করা হয়। একটার পর একটা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়। সর্বশেষ ১৯৭২ সালে রচিত সংবিধানকে কবরস্থ করে ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে জরুরী অবস্থা জারি করা হয়, ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় শাসন কায়েম করা হয় এবং ফেব্রুয়ারিতে বাকশাল গঠন করার মাধ্যমে সেই জাতীয় দল গঠন করা হয়। বাকশাল ছাড়া অন্য সকল দল নিষিদ্ধ করা হয় এবং ৫টি বাদে সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করা হয়। এ সময় যদি একটি যথার্থ মার্কসবাদী দল উপস্থিত থাকতো তাহলে এর বিরুদ্ধে সত্যিকারের প্রতিরোধ গড়ে তোলা যেত। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার পর ১৯৯০ সাল পর্যন্ত একের পর এক ক্যু, পাল্টা ক্যু চলতে থাকে এবং সর্বশেষে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সামরিক শাসক এরশাদ ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়। সামরিক শাসনের অবসানের পরও দেশের স্থায়ীত্ব আসেনি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আরোহণের সময় শেখ হাসিনা জামায়াতের সাথে কৌশলগত ঐক্য করেন, ২০০১ সালে বিএনপি জামায়েতের সাথে জোট করে ক্ষমতায় আসে। পরবর্তীতে ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল। এই প্রতিটি সরকারই ক্রমাগত গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে, একের পর এক জনবিরোধী নীতি কার্যকর করেছে এবং শেষ ১৫ বছর আওয়ামী লীগ এই শোষণ-জুলুম-অত্যাচার-বাক স্বাধীনতা হরণকে চূড়ান্ত জায়গায় নিয়ে গেছে। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে আওয়ামী লীগ তার বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের পথ প্রশস্ত করেছে। ইতিহাসের এই বর্ণনায় আমরা নতুন কিছু আনিনি। জুলাই ঘোষণার মধ্যে যে উল্লেখযোগ্য ফাঁকটি থেকে গিয়েছিল তা ভরাট করেছি মাত্র।

বাহাত্তরের সংবিধান প্রসঙ্গে

বাহাত্তরের সংবিধান নিয়ে তাদের আলোচনাটাও অনেকটা একপাক্ষিক। এই ঘোষণাপত্রে তারা ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল নবগঠিত সরকারের ঘোষণা দেয়া হয়– একেই যথার্থ বাংলাদেশের সংবিধানের যথার্থ ভিত্তি হিসেবে ধরছেন। অথচ ১০ এপ্রিলের এই ঘোষণাপত্রে শেখ মুজিবকে সকল প্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রনয়ণের ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে। তাঁকে প্রধানমন্ত্রীসহ সকল মন্ত্রীদের নিয়োগ, গণপরিষদ আহবান ও মূলতবি করা, জনসাধারণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র শেখ মুজিবকে যে ক্ষমতা দিয়েছে, বাহাত্তরের সংবিধান এরচেয়ে বেশি কিছু করেনি। বাহাত্তরের সংবিধান প্রনয়নের ক্ষেত্রে শেখ মুজিব গণপরিষদ নির্বাচনের দিকে না গিয়ে ১৯৭০ সালের গণপরিষদ ও প্রাদেশিক নির্বাচনে বিজয়ী প্রতিনিধিদের নিয়েই গণপরিষদ গঠন করলেন ও সংবিধান প্রনয়নের কাজ শুরু করলেন। ফলে একটা অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংবিধান রচনা শুরু হলো। জুলাই ঘোষণার ঘোষণাকারীরা হয়তো লক্ষ্য করেননি, তারা স্বাধীনতার ঘোষণপত্রে উল্লেখিত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার– এই তিনটি শব্দের উপর যে জোর দিয়েছেন, তাও বাহাত্তরের সংবিধানে উল্লেখ করা আছে। এগুলোকে অন্যতম মূল লক্ষ্য হিসেবে সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে। কথাটা এইভাবে আছে যে, "...আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা– যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।"

এটা বলাই বাহুল্য যে, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের স্বাধীনতা ঘোষণার মতোই বাহাত্তরের সংবিধানেও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবের হাতে প্রভূত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়। ফলে আমাদের দলের সুবিবেচিত মতামত হলো যে, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও ১৯৭২ সালের সংবিধানের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই।

আমরা আরও মনে করি, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, মৌলিক মানবাধিকার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক -সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার– এই শব্দগুলো লক্ষ কোটি জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হওয়ার ফলে আওয়ামী লীগ বাহাত্তরের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিল। মানব সভ্যতার এই প্রগতিশীল ধারণাগুলো কার্যকর করার কোন ইচ্ছাই তাদের ছিল না, যা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যখন আমরা দেখি ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রনয়নের তিন বছরের মধ্যেই শেখ মুজিব চারটি সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে জরুরী অবস্থা জারি করে একদলীয় শাসন বাকশাল চালু করেন।

এই সংবিধান প্রনয়নের আগে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভায় জাতীয়তাবাদ,

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে 'কেমন শিক্ষাব্যবস্থা চাই' শীর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠিত

গত ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরসি মজুমদার মিলনায়তনে গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী শিক্ষা ভাবনা নিয়ে 'কেমন শিক্ষাব্যবস্থা চাই' শিরোনামে একটি সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সালমান সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রাফিকুজ্জামান ফরিদের সঞ্চালনায় সংলাপে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান, অধ্যাপক কামরুল হাসান মামুন, ড. সামিনা লুৎফা নিত্রা, রাখাল রাহা, অধ্যাপক নাভিন মুর্শিদ, শিক্ষক শামীম জামান প্রমুখ।

শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে 'চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান ও শ্রমিকের প্রত্যাশা' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৯ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে জাতীয় প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম হলে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে 'গণঅভ্যুত্থান ও শ্রমিকের প্রত্যাশা' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মানস নন্দীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রেজার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ সভায় আলোচনা করেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক ও শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের উপদেষ্টা মাসুদ রানা, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোশাহিদা সুলতানা, বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডাক্তার দলিলুর রহমান, শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের সদস্য আব্দুল্লাহ আল কাফি রতন ও বিভিন্ন ক্রাফট সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

শেরপুরে যুব ফ্রন্টের আলোচনা সভা ও সদস্য কার্ড বিতরণ

বাংলাদেশ যুব ফ্রন্টের উদ্যোগে শেরপুর জেলা শহরে গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে '৭১ থেকে ২৪: মুক্তির লড়াই' শীর্ষক মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা শেষে নতুন সদস্যদের হাতে সংগঠনের সদস্য কার্ড তুলে দেয়া হয়।

মোংলায় রোকেয়া দিবস উদযাপন

গত ২০ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে রোকেয়া সাখওয়াত হোসেনের জন্ম ও মৃত্যু দিবস উপলক্ষে বাগেরহাট জেলার মোংলায় 'চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে নারী ও নারীমুক্তি প্রসঙ্গে' শীর্ষক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দীপা বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনা করেন বাসদ (মার্কসবাদী) বাগেরহাট জেলার নেতা স্বপন অধিকারী।

গাইবান্ধায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের ডেলিভারি সেন্টার বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে বাসদ (মার্কসবাদী)

সপ্তাহে সাতদিন ২৪ ঘন্টা খোলা থাকা গাইবান্ধা সদর উপজেলার অন্তর্গত ঘাগোয়া ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের ডেলিভারি সেন্টার বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছে বাসদ (মার্কসবাদী)। গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে প্রয়োজনীয় সেবাকর্মী নিয়োগ করে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনার দাবিতে উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের সামনে বাসদ (মার্কসবাদী) মানববন্ধন ও সমাবেশ করে। সমাবেশ শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর স্মরক লিপি পেশ করা হয়।

জয়পুরহাটের পুরানাপৈল ইউনিয়নের কবি নজরুল পাঠাগারের ৪র্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

শিশু-কিশোরসহ সর্বস্তরের এলাকাবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ

আলোচনা, কুইজ প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে শেষ হয় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম পাঠাগারের ৪র্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। গত ২২ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন পাঠাগারের উপদেষ্টা আমদই ইউনাইটেড কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল সাইফুল ইসলাম। পরিচালনা করেন পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা একরামুল হক। বক্তব্য রাখেন পাঠাগারের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য, কড়ই আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক দিলফুর রহমান। বক্তব্য রাখেন হারেজ আলি, রাজু আহমেদ, দীপক কুমার খাঁ, জহুরুল ইসলাম, রুহুল আমিন বাবু, তৌফিকা লিজা, এডভোকেট সুমন চন্দ্র কুণ্ডু প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদ এবং জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

পাঠাগারের সদস্যরা নাচ, গান ও আবৃত্তি পরিবেশন করে। শিশু কিশোরদের দুটি বিভাগে কুইজ প্রতিযোগিতা ও মহিলাদের মিউজিক্যাল চেয়ার প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

গাইবান্ধার দারিয়াপুরে প্রীতিলতা পাঠাগারের উদ্যোগে বিজয় উৎসব

তরুণ-যুব সমাজের অবক্ষয় রোধে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে গত ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে দারিয়াপুরে বীরকন্যা প্রীতিলতা পাঠাগারের উদ্যোগে সারাদিনব্যাপী খেলাধুলা, বিকেলে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

সাম্যবাদ
'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'-এর মুখপত্র

রোকেয়া দিবস উপলক্ষে নারীমুক্তি কেন্দ্রের সেমিনার

গত ১০ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ বিকেল ৪টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরসি মজুমদার হলে নারীমুক্তি কেন্দ্রের এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংগঠনের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সুস্মিতা রায়। সেমিনারে আলোচনা করেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, সুপ্রিম কোর্টের জেষ্ঠ্য আইনজীবী সারা হোসেন, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সদস্য এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক সদস্য নিরূপা দেওয়ান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক সামিনা লুৎফা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক স্নিগ্ধা রেজওয়ানা, জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য ডা. তাজনুভা জাবীন, স্থপতি ফারহানা শারমীন ইমু, নাট্যকর্মী ও শিক্ষক মহসিনা আক্তার, মিরণজল্লা হরিজন ভূমি রক্ষা আন্দোলনের সংগঠক দীপিকা রাণী, শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মী বীথি ঘোষ, বাসদ (মার্কসবাদী) দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য জয়দীপ ভট্টাচার্য।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দাবি নিয়ে ময়মনসিংহে ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের স্মারকলিপি

গত ২ জানুয়ারি হালুয়াঘাটে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কৃষি ঋণ মওকুফ, ঋণ পরিশোধের নোটিশ প্রত্যাহার ও বোরো মৌসুমে সেচের অতিরিক্ত মূল্য প্রত্যাহারের দাবিতে বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের উদ্যোগে বিক্ষোভ ও ইউএনও বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপি প্রদানের পূর্বে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠন ময়মনসিংহ জেলা সংগঠক অজিত দাস, উপজেলা সংগঠক আব্দুর রাজ্জাক, মোসলেম উদ্দিন, সিদ্দিক মিয়া, সফর আলী প্রমুখ। স্মারকলিপি গ্রহণ করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কৃষকদের দাবি বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন।

ফেলানি হত্যা দিবসে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ফোরামের উদ্যোগে ক্যাম্পাসে ছাত্র সমাবেশ

ভারত সীমান্তে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার এবং ভারতের সাথে করা সকল অসম চুক্তি বাতিলের দাবিতে গত ৭ জানুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফেলানি হত্যা দিবস পালিত হয়। সমাবেশ থেকে ভারতের সাথে বাংলাদেশের করা সকল অসম চুক্তি বাতিলের দাবি তোলা হয়।

ময়মনসিংহের থানাঘাট এলাকায় মাজার ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার করুন স্থানীয় নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে সংস্কার ও নির্বাচনকে আরও দীর্ঘসূত্রিতায় ফেলবেন না চালের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করুন ও টিসিবির কার্ডধারীদের সংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন

—বাম গণতান্ত্রিক জোট

গত ১০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে বাম গণতান্ত্রিক জোট কেন্দ্রীয় পরিচালনা পর্ষদের এক সভা আজ 'বাসদ (মার্কসবাদী)' কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বামজোটের সমন্বয়ক ও বাসদ (মার্কসবাদী)-এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক মাসুদ রানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, সহ-সাধারণ সম্পাদক মিহির ঘোষ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ, বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক আবদুস সাত্তার ও নজরুল ইসলাম, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু এবং বাসদ (মার্কসবাদী) নেতা মানস নন্দী।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, "সারাদেশে মাজার-উপাসনালয়ে হামলা ও ভাঙচুর চলছেই। গত ৮ জানুয়ারি রাতে ময়মনসিংহ সদরের থানাঘাট এলাকায় প্রায় ২০০ বছরের পুরোনো হজরত শাহ সুফি সৈয়দ কালু শাহ (রহ.)-এর মাজারের বাৎসরিক ওরসের সময় কাওয়ালি অনুষ্ঠানে হামলা ও মাজার ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। মাজার ভাঙচুরের ঘটনায় সরকারের পক্ষ থেকে বারবার কতগুলো কাগুজে হুশিয়ারি ছাড়া আর কোন পদক্ষেপই আমরা দেখছি না। এদেশে বিভিন্ন মত-পথ-ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের নিজেদের মতো করে বিশ্বাস ধারণ ও সংস্কৃতি পালনের অধিকার রাখে। এতে কেউ বাধা দিতে পারে না। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তীতে মাজারে হামলা করাটা একটা সহজ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারের এক্ষেত্রে কথা না বাড়িয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া উচিত। ইতোপূর্বে ঘটে যাওয়া সবগুলো হামলা ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনার বিচার করতে হবে।"

নেতৃবৃন্দ স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেন, "সংস্কার কমিশনগুলোর রিপোর্ট প্রকাশ করে কী প্রক্রিয়ায় সংস্কার ও নির্বাচন হবে, সেজন্য কতদিন সময় লাগবে- এ সম্পর্কিত কোন স্পষ্ট রোডম্যাপ সরকার এখনও প্রকাশ করছে না। গোটা ব্যাপারটাই যেখানে এখনও অস্পষ্ট, সেই সময়ে, গত পরশুদিন প্রধান উপদেষ্টা ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট নিকোলা বিয়ারের সঙ্গে আলোচনার সময় স্থানীয় নির্বাচন আয়োজনের ব্যাপারে বলেছেন। আমরা মনে করি, সরকার সংস্কার ও জাতীয় নির্বাচনের রোডম্যাপ আগে ঘোষণা করুক। এর সাথে স্থানীয় নির্বাচন যুক্ত করলে সংস্কার প্রক্রিয়া অযথা বিলম্বিত হবে।"

নেতৃবৃন্দ সরকারের এই সময়ে গৃহিত বেশকিছু পদক্ষেপ মেহনতি মানুষের পক্ষে যাচ্ছে না বলে মনে করেন। তারা বলেন, "দেশের নিম্নবিত্ত জনগণের পরিস্থিতি বিবেচনা করে সরকারের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। কারণ আওয়ামী লীগ আমলে তীব্র শোষণের স্বীকার হয়ে এই জনগণ মাঠে নেমেছিল, প্রাণ দিয়েছিল। অথচ সরকারের পদক্ষেপগুলো এর বিরুদ্ধে যাচ্ছে। এরইমধ্যে আইএমএফের প্রেসক্রিপশনে পরোক্ষ কর বাড়ানো হয়েছে। সম্প্রতি টিসিবির সুবিধা পাওয়া এক কোটি জনগণের মধ্যে ৪৩ লক্ষের কার্ড বাতিল করা হয়েছে আওয়ামী লীগ আমলের অনিয়মের কথা তুলে। অনিয়মের এই সংখ্যা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আর সেটা হলেও যার ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়েছে তার কার্ড বাতিল করে প্রকৃত লোককে কার্ড প্রদান করা উচিত। কিন্তু অনিয়মের অজুহাত তুলে ৪৩ লক্ষ মানুষের কার্ড বাতিল করে রাষ্ট্রের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব সংকোচন করা চলে না। আমরা পূর্বেই বলেছি, দেশে যে পরিমাণ নিম্নবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্ত ও গরীব মানুষ আছেন, সেখানে এক কোটি কার্ডও অপ্রতুল।

এখন আমনের ভরা মৌসুম, অথচ চালের দাম বাড়ছে। সরকার সিন্ডিকেটকে কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গঠিত সরকারের জনগণের প্রতি কমিটমেন্ট থাকা উচিত। সিন্ডিকেটকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। সবচেয়ে বড় কথা, সরকার পরিচালনা করা উচিত এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ গরীব-মেহনতি মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে। আমরা অবিলম্বে চালের দাম কমানো এবং টিসিবির কার্ডের সংখ্যা ও পণ্যের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি করছি।"

বহুতল ভবন নির্মাণ করে ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের দাবিতে রংপুরে বিক্ষোভ ও ডিসিকে স্মারকলিপি প্রদান

গত ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণ করে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন, প্রত্যেক গরীব পরিবারের জন্য আর্মি-পুলিশের রেটে রেশন ও চাল, ডাল, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল পণ্যের দাম কমানোর দাবিতে রংপুরে ভূমিহীন ও গৃহহীন সংগঠন বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে এবং পরবর্তীতে ডিসিকে স্মারকলিপি পেশ করে। প্রধান সংগঠক আনোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠক আহসানুল আরেফিন তিতু, আম্বিয়া খাতুন, আব্দুল আজিজ প্রমূখ।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার খাসজমিতে পুনর্বাসনের জন্য অনেক আগেই ভূমিহীনরা আবেদন করেছেন। আমরা ভূমিহীন সংগঠনের পক্ষ থেকে ওইসকল খাসজমির তফশীলও তৎকালীন জেলা প্রশাসককে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ আজও গ্রহণ করা হয়নি। বিগত সরকারের সময়ে দায়িত্বে থাকা জেলা প্রশাসক বলেছিলেন, এই খাসজমি ভূমিহীনদের দেয়া যাবে না। কিন্তু ওইসকল খাসজমি ঠিকই বিত্তবানরা অবৈধভাবে ভোগদখল করছে। তারা সেদিন আবারও নতুন করে তালিকসহ ভূমিহীনদের আবেদন জেলা প্রশাসকের কাছে জমা দেন।

'বাসদ (মার্কসবাদী)'—এর ৭ সদস্য বিশিষ্ট সিলেট জেলা সাংগঠনিক কমিটি গঠন

গত ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানার উপস্থিতিতে সিলেট জেলা শাখার এক সভায় সঞ্জয় কান্ত দাসকে সমন্বয়ক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট জেলা সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন-অজিত রায়, নমিতা রায়, সুমিত কান্তি দাশ পিনাক, বুশরা সুহেল, দোয়েল রায়, মিসবাহ্ খান প্রমুখ।

বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত

গত ১১ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে গাইবান্ধার দারিয়াপুরে কৃষকনেতা আহসানুল হাবীব সাঈদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সভায় আহসানুল আরেফিন তিতুকে সভাপতি ও অজিত দাসকে সাধারণ সম্পাদক করে বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের ৮ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন– আহসানুল হাবীব সাঈদ, আনোয়ার হোসেন বাবলু, গোলাম সাদেক লেবু, রফিকুল ইসলাম, আলাল মিয়া ও একরামুল হক।

৩য় পৃষ্ঠার পর

জুলাই ঘোষণা

ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে মুজিববাদ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে সংবিধানে এটাকেই মূলনীতি করা হয়। এটাকে কেন্দ্র করে এই প্রশ্ন এখন এসেছে যে, এই সংবিধানের ভাবাদর্শগত ভিত্তি হলো মুজিববাদ। এক্ষেত্রে জেনে রাখা উচিত যে, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা একটা আধুনিক, গণতান্ত্রিক সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়ারা সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, নারীস্বাধীনতা, এক মানুষ-এক ভোট এসকল প্রগতিশীল ধারণাগুলো নিয়ে এসেছিল। এরপর থেকে সকল বুর্জোয়া রাষ্ট্রই তাদের সংবিধানকে এই ধারণাগুলোর উপর দাঁড় করায়। যদিও আজকের এই সাম্রাজ্যবাদের যুগে আন্তর্জাতিকভাবে বুর্জোয়ারা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যাওয়ার কারণে সকল দেশেই এই ধারণাগুলো সংবিধানে লেখা আছে, বাস্তবে রাষ্ট্রের কোথাও এর কার্যকরিতা নেই। ১৯১৭ সালে রুশদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠিত হয়। পূব দিগন্তে এই সভ্যতার উদয় দেখে একে সালাম জানিয়েছিলেন আইনস্টাইন, রমাঁরুল্যা, বার্ট্রান্ড রাসেল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলামসহ বিভিন্ন মনীষীরা। এরপর থেকে স্বাভাবিকভাবেই উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলনে রুশ দেশের এই শোষণবিহীন সমাজব্যবস্থা সমাজতন্ত্র জনগণের একটা গুরুত্বপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা হিসাবে বারবার ধ্বনিত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামেও বহু বুদ্ধিজীবীর মুখ থেকে সমাজতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। সংবিধান প্রনয়নের সময়ও এই দাবি উঠেছে। ১৯৭২ সালের ২ এপ্রিল পল্টনে ভাসানী বলেন, "একটি ন্যাশনাল কনভেনশন ডেকে সকলের মতামত নিয়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা উচিত ছিল। কিন্তু সরকার তা করেনি।" . . ."পরিষদের যে একদলীয় শাসনতন্ত্র প্রণীত হচ্ছে তাতে কৃষক শ্রমিক সর্বহারা মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং খাঁটি সমাজতন্ত্রের নিশ্চয়তা থাকতে হবে।" ১৯৭২ সালের ১৪ এপ্রিল সন্তোষে ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটি সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়– "সংবিধান হবে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক। সকল ধর্ম মতের অনুসারী বাঙালি অবাঙালি নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকার পায়, সেজন্য শাসনতন্ত্রে নিশ্চয়তা থাকতে হবে।" ফলে আওয়ামী লীগ মুজিববাদ বলে যা দাবি করেছে, তা অন্তসারশূণ্য। এর পরের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ১৯৭২ সালের প্রণীত সংবিধানের উপর মোট ১৭টি সংশোধনী বিভিন্ন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল এনেছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংশোধনী ছাড়া এর প্রত্যেকটি সংশোধনী জনগণের অধিকার কোন না কোনভাবে খর্ব করেছে। আমাদের দলের অভিমত হলো, বাহাত্তরের সংবিধানের প্রগতিশীল ইতিবাচক দিকগুলোকে অক্ষত রেখে মূলত: কাঠামোগত দিকটা সংস্কার করা উচিত বলে আমরা মনে করি। একইসাথে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কাজ– এই ছয়টি মৌলিক অধিকারকে 'মৌলিক অধিকার' অধ্যায়ে সংযুক্ত করা উচিত এবং মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে রচিত অধিকারগুলোকে আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য করা উচিত।

একটা কথা আমরা বলতে চাই, একটা গণতান্ত্রিক সংবিধান অবশ্যই জনগণের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এই ধনী ও দরিদ্র, বৃহৎ ব্যবসায়ী ও মেহনতি মানুষ, শোষক ও শোষিতে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে সংবিধান সংস্কার করা সহজ, কিন্তু কার্যকর করা সহজ নয়।

দেশের সার্বভৌমত্ব প্রসঙ্গে

জুলাই ঘোষণাপত্রে এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে নিয়ে আসা জরুরী ছিল। বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই দুনিয়ার বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, যেমন ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় দেশগুলো ও পরবর্তী চীন, রাশিয়া, জাপান তাদের বাজার সম্প্রসারনের লক্ষে এদেশের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের উপর বারংবার হস্তক্ষেপ করেছে। বর্তমান সময় এই হস্তক্ষেপ অনেকগুণ বেড়েছে। আমরা দ্বিধাহীনভাবে বলতে চাই যে, সবরকম সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিত। দেশকে কোনভাবেই জিম্মি রাখা যাবে না। দেশের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখা সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

ঘোষণাপত্র দুইটির মধ্যে পার্থক্য

প্রথম ঘোষণাপত্রে ৩০ নম্বর ঘোষণার ৩ নম্বর পয়েন্টে যে সকল রাজনৈতিক দলের নেতাদের অংশগ্রণে সরকার গঠন, 'ডিকলোনাইজড ট্রুথ এন্ড হিলিং কমিশন'-এর প্রস্তাবনা, সেনাশাসন-রাষ্ট্রীয় পুঁজি-বৃহৎ ব্যবসায়ী-আমলাতন্ত্র এদের বিরুদ্ধে প্রস্তবনা– এই প্রস্তাবনাগুলি অজ্ঞাত কারণে দ্বিতীয় ঘোষণায় নেই।

নতুন জনতন্ত্র (রিপাবলিক) প্রসঙ্গে

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সূচনা হয়। ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার বীরত্বপূর্ণ, বিপুল আত্মত্যাগের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে ইতোমধ্যেই জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু এই গণঅভ্যুত্থান পুরনো ব্যবস্থার পরিবর্তন করে নতুন কোন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেনি। কোন নতুন রাষ্ট্রেরও জন্ম দেয়নি। একটি চূড়ান্ত অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেনাসমর্থনে, বর্তমান সংবিধানের অধীনে শপথ নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করেছে। ফলে দ্বিতীয় রিপাবলিকের ধারণাটি সঠিক নয়।

গণঅভ্যুত্থান প্রসঙ্গে

আওয়ামী লীগের গত ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব জাগরণ এই গণঅভ্যুত্থান। প্রায় দেড় হাজারেরও অধিক প্রাণ দিয়েছেন এই আন্দোলনে। আহত হয়েছেন ২৫ হাজারেরও অধিক। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভ্যুত্থানে আমরাও সর্বশক্তি নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এদেশে কোন গণঅভ্যুত্থানকেই এত রক্তের স্রোত পাড়ি দিতে হয়নি। এত মানুষকে চোখের দৃষ্টি হারাতে হয়নি, পঙ্গু হতে হয়নি। এই বিরাট আত্মত্যাগ এই সময়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

এই গণঅভ্যুত্থান থেকে ফ্যাসিবাদ ধ্বংসের স্লোগান উঠেছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের পতন মানেই ফ্যাসিবাদের পতন নয়। ফ্যাসিবাদ কোন দল আনে না, ফ্যাসিবাদ আনে একটি ব্যবস্থা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে উন্নত কিংবা অনুন্নত সকল দেশেই ফ্যাসিবাদী প্রবণতা দেখা যায়। ফ্যাসিবাদ কায়েম একদলীয় শাসনের মাধ্যমে হতে পারে, দ্বি-দলীয় শাসনের মাধ্যমে হতে পারে, সামরিক শাসনের মাধ্যমে হতে পারে। দুনিয়ার দেশে দেশে ফ্যাসিবাদ গণতন্ত্রের মুখোশ পড়েই এসেছে। আজকের যুগে কোন পুঁজিবাদী দেশই জনজীবনের কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে না। ফলে সে জনগণের বিক্ষোভ দমনে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে। এই ফ্যাসিবাদী প্রবণতা এ যুগে প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী দেশে বিদ্যমান। অর্থাৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র মাত্রেই সে আজ কমবেশি ফ্যাসিবাদী।

বর্তমান সময়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ বা মানবতাবাদী মূল্যবোধ কোনটাই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বেপরোয়া লুণ্ঠন, শোষণ ও অত্যাচার রুখতে পারবেনা। পুঁজিবাদী সমাজের মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয়, অসহনীয় বেকারত্ব, একটার পর একটা দেশে ভয়াবহ যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নর-নারী ও শিশু হত্যাকাণ্ড, অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু– এই অধঃপতিত সমাজের একমাত্র বিকল্প সমাধান মার্কসবাদ। তাই একটা দেশে একটা যথার্থ মার্কসবাদী দলের নেতৃত্বে সমাজ পরিবর্তনের লড়াই ছাড়া সমাজমুক্তি অসম্ভব।

এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদের বিলোপ ঘটেনি, ফ্যাসিবাদ পিছু হটেছে মাত্র। বিরাজমান ব্যবস্থা পরিবর্তনের কোন এজেন্ডা এই গণঅভ্যুত্থানের ছিল না। রাষ্ট্রের নানা গণতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি এই অভ্যুত্থান পরবর্তীতে উঠেছে। কারণ আওয়ামী লীগের ১৬ বছরের শাসনে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এই গণতান্ত্রিক সংস্কার অপরিহার্য, তাতে দেশের গণতান্ত্রিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠান কিছুটা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তাতে ফ্যাসিবাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সম্ভব নয়। এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ না ঘটিয়ে ফ্যাসিবাদের উচ্ছেদ সম্ভব নয়। তা না হলে অনেক আত্মত্যাগের মাধ্যমে বারবার ভোটের অধিকার, মতপ্রকাশের অধিকার অর্জিত হবে– আর গণআন্দোলনের শক্তি দুর্বল হলে, আন্দোলনের নেতৃত্ব পুঁজিপতি-শিল্পপতিদের দলগুলোর হাতে থাকলে, বারবারই তা হাতছাড়া হবে। আবারও নেমে আসবে নির্মম গণতন্ত্রহীন পরিবেশ। তাই কোন পথে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন প্রকৃত অর্থেই সফল হতে পারে– সেটা নির্ধারণ করা ও সে পথে সংগ্রাম পরিচালনা করা গুরুত্বপূর্ণ। এটাই আমাদের দলের কাছে ধারাবাহিকভাবে ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, এরপর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পেরিয়ে আবার ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থান এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের চেতনা।

ঘোষণাপত্রকে কেন্দ্র করে আমাদের আলোচনা আমরা রাখলাম। আমরা মনে করি, সকল রাজনৈতিক দল, ছাত্রসংগঠন, অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সংগঠন ও সর্বোপরি নাগরিক সমাজের সুচিন্তিত মতামত নিয়ে ঐক্যমতের মাধ্যমেই ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করা উচিত।

৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হয়। গত ৮ আগস্ট অর্থাৎ ৫ মাস আগে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসে। এই সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। কারণ আমাদের দলও এই গণঅভ্যুত্থানের অংশীদার। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জনজীবনের বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানে যথার্থ পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়নি। এমতাবস্থায় নিম্নোক্ত দাবিগুলো সরকার অবিলম্বে কার্যকর করবে বলে প্রত্যাশা করছি।

দাবিসমূহ:

১. অতি সত্বর গণঅভ্যুত্থানে নিহতদের প্রকৃত তালিকা প্রকাশ করতে হবে। তাদের পরিবারকে পুনর্বাসন করতে হবে। জুলাই গণহত্যার দ্রুত বিচার করতে হবে।

২. আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে। যেসকল আহতদের বিদেশে পাঠানোর জন্য রেফার করা হয়েছে, এদের ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে।

৩. বিভিন্ন পণ্যে ভ্যাটবৃদ্ধির জনবিরোধী সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সিন্ডিকেট ও বৃহৎ কর্পোরেট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. সর্বজনীন রেশন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। টিসিবির ৪৩ লক্ষ কার্ড বাতিল ও ট্রাক সেল বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে।

৫. ন্যূনতম জাতীয় মজুরি ২০ হাজার টাকা ও গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা ঘোষণা করতে হবে।

৬. কৃষকদের ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত কর। বর্তমানে ইরি মৌসুম চলছে। এই মৌসুম থেকেই ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে। সার, বীজসহ কৃষি উপকরণের দাম কমাতে হবে।

৭. সংস্কার ও নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে।

৮. সারাদেশে সাম্প্রদায়িক উগ্রতা, মাজার ভাঙা, উরস বন্ধ করে দেয়া– এসবের বিরুদ্ধে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

শেষ পৃষ্ঠার পর

আইনজীবী আলিফ হত্যা

পূর্বের মতোই সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। এছাড়া, এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরও সহিংসতা ও অস্থিতিশীলতা তৈরি হতে পারে বলে কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির একটি 'প্রতিনিধি দল' চট্টগ্রামের পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে করণীয় নির্দেশ করার জন্য চট্টগ্রাম সফর করেন। ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়ার নেতৃত্বে এই প্রতিনিধি দলে আরও ছিলেন অধ্যাপক ডা. হারুন অর রশিদ, আব্দুল্লাহ্ আল কাফি রতন, সীমা দত্ত, সত্যজিৎ বিশ্বাস ও রাফিকুজ্জামান ফরিদ। চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হন আইনজীবী জনাব জহির উদ্দিন ও আইনজীবী জনাব শফিউদ্দিন কবির আবিদ।

তারা সরেজমিনে পরিদর্শন করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মামলা প্রদান ও তদন্ত কাজ সঠিক প্রক্রিয়ায় চলছে না। গণহারে মামলার আসামী করা হয়েছে এবং গ্রেফতারবাণিজ্য চলছে। এর ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করছেন বান্ডেল রোডের হরিজন পল্লীর বাসিন্দারা। কেবল নাম-পরিচয়ে হিন্দু হওয়ার কারণে চট্টগ্রাম আদালতের অর্ধশতাধিক আইনজীবীকে আসামী করে বিস্ফোরক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে, গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী আইনজীবীও মামলার আসামী হয়েছেন। বাস্তবে আলিফ হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার না করে স্বার্থান্বেষী মহল যার যার মতো করে এখান থেকে সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁরা আইনজীবী আলিফের পিতা ও ভাইয়ের সাথেও কথা বলেছেন। দুইজনই মনে করেন, প্রকৃত হত্যাকারীদের বিচার হওয়া উচিত কিন্তু বিচারের নামে নিরীহ কাউকে হয়রানি করা হউক– সেটা তাঁরা চান না।

সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত দাবি উত্থাপন করা হয়–

১. আইনজীবী আলিফ হত্যার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে স্বার্থান্বেষীদের ফায়দা লুটতে দেয়া চলবে না।

২. কোর্ট প্রাঙ্গনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও ভাঙচুরের ঘটনার সঠিক তদন্ত করতে হবে। এই ঘটনায় উস্কানিদাতাদের খুঁজে বের করতে হবে। একইসাথে ঘটনার সময়ে সেবকপল্লীতে ও পাশের আরেকটি হিন্দু পল্লীতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় মামলা দায়ের করে বিচার নিশ্চিত করতে হবে। যারা এই পরিস্থিতিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দিকে নিয়ে যেতে চাইছিলো তাদের দ্রুত চিহ্নিত করা প্রয়োজন। কারণ ভবিষ্যতেও তারা একই ধরণের অপরাধমূলক তৎপরতা চালাতে পারে।

৩. অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে বান্ডেল রোডের সেবক কলোনির হরিজনদের হয়রানি ও সেখানে যে ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

৪. যথাযথ প্রক্রিয়ায় তদন্ত করতে হবে। ঘটনার সময়ের সিসিটিভি ফুটেজগুলো পরীক্ষা করতে হবে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ব্যতীত কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না। গণগ্রেফতার ও গ্রেফতারবাণিজ্য বন্ধ করতে হবে।

৫. চিন্ময় কৃষ্ণ দাসসহ সকল অভিযুক্ত ও আটক ব্যক্তির বিচার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তাদের আইনজীবীরা যাতে আদালতে জামিনের আবেদনসহ সকল ধরণের আইনি পদক্ষেপ নির্বিঘ্নে নিতে পারেন, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। আত্মপক্ষ সমর্থন করা ও বিচার পাওয়ার অধিকার সকল মানুষের আছে। এটা লঙ্ঘিত হলে একদিকে যেমন ব্যক্তির আইনি ও সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুন্ন হবে, অপরদিকে বহির্বিশ্বের কাছে অভ্যুত্থানের নামে যে মিথ্যে প্রচার চালানো হচ্ছে, সেটাই শক্তিশালী হবে। আমরা এর অবসান চাই।

সাম্যবাদ
১৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২৫

শেষ পৃষ্ঠার পর

সংখ্যানুপাতিক নিবার্চন

জার্মানি, ইতালি, জাপান, সাউথ কোরিয়া, নিউজিল্যান্ড, মেক্সিকোর মতো প্রায় ৩০টি দেশে। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক ভোটার নির্বাচনে দুটি ভোট দেন। একটি ভোট আসনের প্রার্থীর জন্য এবং আরেকটি ভোট দলের জন্য। কেউ চাইলে তাঁর দলীয় ভোট পছন্দের দলকে দিয়ে আসনের ভোট অন্য কাউকে দিতে পারেন। প্রতিটি আসনে প্রার্থীদের মধ্যে যিনি সর্বোচ্চ ভোট পান, তিনি নির্বাচিত হন।

সাধারণত সংসদের অন্তত অর্ধেক বা তার বেশি আসন সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রার্থীদের জন্য বরাদ্দ থাকে। বাকি আসনগুলোতে দলের পূর্বনির্ধারিত তালিকা থেকে বা যেসব প্রার্থী তাঁদের আসনে জিততে পারেননি কিন্তু অনেক ভোট পেয়েছেন তাঁদের দেওয়া হয়। কোন দল কত শতাংশ দলীয় আসন পাবে, তা একেক দেশে একেকভাবে নির্ধারিত হয়। কিছু দেশে কেবল দলীয় ভোটের শতাংশ অনুসারে আসন দেওয়া হয়। আবার কিছু দেশে এমনভাবে আসনবিন্যাস করা হয় যেন পূর্ণ সংসদে প্রতিটি দলের সরাসরি নির্বাচিত ও দলীয় ভোট থেকে প্রাপ্ত মোট আসন দলের পাওয়া মোট ভোটের যথাসম্ভব সমানুপাতিক হয়।

আনুপাতিক নির্বাচনের সফলতা নির্ভর করে কোন নির্দিষ্ট দেশের পরিস্থিতি সাপেক্ষে এর প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্টকরণের উপর। সাধারণত এ পদ্ধতিতে কোন দলের পক্ষে ৫১ শতাংশ সমর্থন বা এককভাবে সরকার গঠন কঠিন। ফলে কোয়ালিশন বা জোট সরকার গঠনের সম্ভাবনা বেশি থাকে। বিষয়টি বাংলাদেশের অতীত নির্বাচনগুলোতে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের হার দেখলেও বোঝা যায়। যেহেতু কোন দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে তাই স্বৈরাচারী হয়ে উঠার সম্ভাবনা কম থাকে। সরকারে শরিক দলগুলোর মতামতকে গুরুত্ব দিতে হয়। না হলে সমর্থন উঠিয়ে নিলে সরকার টিকবে না। এভাবে একটা গণতান্ত্রিক চর্চা, সহনশীলতার মনোভাব গড়ে উঠার পরিবেশ তৈরি হয়।

আসনভিত্তিক নির্বাচনে লড়াইটা অনেকক্ষেত্রে দু'জন প্রার্থীর বা দলের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে কোন আসনে ভোটারের পছন্দের প্রার্থী থাকলেও তারা জিততে পারবে না মনে করে, ভোট নষ্ট হবে মনে করে, অধিকতর অপছন্দের দলকে ঠেকাতে দু'জন প্রার্থী বা দলের একটি বেছে নেয়। এভাবে একটা দ্বিদলীয় বৃত্ত গড়ে উঠে। এদেশে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি যেমন দীর্ঘদিন ধরে দ্বিদলীয় বৃত্ত তৈরি করে রেখেছে। জনগণ এর বাইরে যেতে পারছে না। বিকল্প শক্তির উত্থানও এ পদ্ধতিতে সম্ভব হয় না। ছোট দলগুলো যতটুকু জনসমর্থন পায় তাতে কোন আসনে জিততে পারে না বলে সংসদে যেতে পারে না। আনুপাতিক নির্বাচনে এরকম হওয়া কঠিন। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি ভোটই হিসেবে আসে। ফলে সংসদে বহুদলীয় প্রতিনিধিত্বের সম্ভাবনা বাড়ে, গণতন্ত্র বা সংসদ সত্যিকার অর্থে বহুদলীয় হয়ে উঠার সুযোগ তৈরি হয়।

আমরা জানি, আমাদের দেশে নির্বাচনের সময় এমপি প্রার্থীরা কোটি কোটি টাকা খরচ করে। নির্বাচন হয়ে উঠে টাকা ও পেশি শক্তির খেলা। এর বিরুদ্ধে কার্যকর কোন প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় না। নির্বাচন কমিশনও শক্তিশালী না হওয়ায় দলীয় ক্যাডার বাহিনীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না। ফলে একেকটি সংসদীয় এলাকা হয়ে উঠে একেকজন সাংসদের মাস্তানি ও গুন্ডামির অভয়ারণ্য। এলাকার উন্নয়ন কাজের ভাগ বাটোয়ারা নিয়েই এমপিরা ব্যস্ত থাকেন। সংসদে আইন প্রণয়নে তাদের ভূমিকা থাকে যৎসামান্যই। সেক্ষেত্রে আনুপাতিক নির্বাচনে দলভিত্তিক ভোট হওয়ায় দলগুলোর কর্মসূচী, নীতি, আদর্শ সামনে আসার সুযোগ তৈরি হয়, এগুলোই আলোচনার প্রধান বিষয় থাকে। আর এলাকাভিত্তিক না হওয়ায় এতে স্থানীয় মাস্তান ও গুন্ডাবাহিনী দৌরাত্ম্য তুলনামূলকভাবে কমার সম্ভাবনা থাকে।

তবে অনেকে মনে করেন, এলাকাভিত্তিক প্রার্থী না থাকলে সাংসদদের জনগণের সাথে সম্পর্ক বা জবাবদিহিতার ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এলাকার অনেক সমস্যা যেহেতু এমপিরাই সমাধান করেন সেক্ষেত্রেও শূন্যতা তৈরি হতে পারে। কিন্তু এই অভিযোগের সারবত্তা খুব কম। এদেশের জনগণের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব, অভিযোগ নিরসনে আদৌ বুর্জোয়া দলগুলোর নেতাদের ভূমিকা আছে? জনগণের সাথে সম্পর্ক আছে? উন্নয়ন কাজ দেখার দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের। কিন্তু স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হয়নি। যতটুকু কাঠামো ছিল, বিগত আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো এটাকেও ধ্বংসের চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে গেছে। ফলে আইন প্রণেতাদের ভূমিকা হবে সংসদে। আর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে এলাকার জনগণের সেবক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের সাথে আনুপাতিক নির্বাচনের সাফল্য সম্পর্কযুক্ত।

আনুপাতিক নির্বাচন হলে পরাজিত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের পুনর্বাসনের সুযোগ তৈরি হবে– এই অভিযোগ তুলেও অনেকে এই পদ্ধতির বিরোধিতা করছেন। এই যুক্তি যারা করছেন তারা জনগণের মতামতের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারছেন না। ভুলে যাচ্ছেন, চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে এদেশের ছাত্র-জনতাই ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগকে পরাস্ত করেছেন। বুলেটের সামনে দাঁড়িয়ে, অনেক প্রাণের বিনিময়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও ভিত্তি রচনা করেছেন। এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণই নির্ধারণ করবে তারা কাকে ক্ষমতায় বসাবে।

তাই সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃত প্রতিফলন ঘটার সম্ভাবনা বেশি। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মূল কথা- সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের প্রতিফলন ঘটার সম্ভাবনা বেশি। এতে নির্বাচনে অর্থ ও পেশিশক্তির ব্যবহার কমবে, সাংসদদের এলাকাভিত্তিক আধিপত্য কমবে, জনগণের সমর্থন আদায়ের জন্য জনগণের কাছে দলগুলোর জবাবদিহিতা বাড়বে, সংসদে কোন বিল পাশ করতে হলে অন্যান্য দলগুলোর মতামত ও অংশগ্রহণ গুরুত্ব পাবে, রাজনীতিতে দলগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়বে। সর্বোপরি কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সুযোগ কম থাকায় স্বৈরাচারী হয়ে উঠার সম্ভাবনা কমবে। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের কেন্দ্রীভূত আকাঙ্ক্ষা ছিল ক্ষমতায় আসীন কোন দল যেন ফ্যাসিস্ট বা স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে না পারে। তাই জনগণের এ আকাঙ্ক্ষা পূরণে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতির প্রবর্তন ও নির্বাচনী ব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রয়োজন।

১ম পৃষ্ঠার পর

হাসিনার অর্থনীতি বহাল

এসব পদক্ষেপের পরও আলু, চাল, চিনি, পেঁয়াজের দাম ১ টাকাও কমেনি, বরং বেড়েছে।

তাহলে কি আন্তর্জাতিক বাজারে দাম খুব বেড়েছে, যার কারণে শুল্ক কমালেও আমদানি ব্যয় কমছে না? অথচ বিশ্বব্যাংকের সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে যেসব ভোগ্যপণ্য আমদানি করা হয়, এর প্রায় সবকটির দামই আন্তর্জাতিক বাজারে কমেছে। পাশাপাশি জ্বালানি তেলের দাম ১০০ থেকে ৭৮ ডলারে নেমে এসেছে। এতে জাহাজ ভাড়াসহ অন্য পরিবহণ খরচ কমেছে। দেশে ডলারের দামও কমেছে। আগে আমদানিতে প্রতি ডলার কিনতে হতো সর্বোচ্চ ১৩২ টাকা করে। এখন তা কমে ১২০ টাকায় নেমে এসেছে। এসব কারণে আমদানি খরচ কমেছে। ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই আমদানি পণ্যের দাম কমার কথা। কিন্তু বাজারে দাম কমেনি। উলটো আরও বেড়ে যাচ্ছে। (ইত্তেফাক ডিজিটাল রিপোর্ট : ৭ ডিসেম্বর, ২০২৪)

তাহলে সরকারের আমদানি শুল্ক কমানো, শুল্ক ছাড়ের পুরো সুবিধা গিয়েছে ব্যবসায়ীদের পকেটে, জনগণের কোন কাজে আসেনি। কারণ সরকার এত কিছু করলেও, আসল জায়গায় হাত দেয়নি। বাজারে সিন্ডিকেট বহাল তবিয়তে আছে।

অথচ পত্রপত্রিকায় দাম বাড়ার পেছনে সিন্ডিকেট যুক্ত থাকার তথ্যগুলো স্পষ্ট উঠে এসেছে। যেমন- আলুর কেজি যখন ৮৫ টাকা ছিল, সেসময়ে, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য মতে, প্রতি কেজি আলুর উৎপাদন খরচ ছিল ১৩ টাকা ৯০ পয়সা। সেই হিসেবে উৎপাদক পর্যায়ে এক কেজি আলু বিক্রি হওয়ার কথা ১৯ টাকা ৪৮ পয়সা। আর পাইকারিতে এক কেজি আলু বিক্রি হওয়ার কথা ২৩ টাকা ৩০ পয়সা। সব ধরনের খরচ মিলে এক কেজি আলুর সর্বোচ্চ দাম হতে পারে ৪৬ টাকা। তাহলে আলুর এ বাড়তি দাম কাদের পকেটে গেল? বাজারে নতুন আলু আসার আগে সাধারণত: নভেম্বর ডিসেম্বরে আলুর দাম বাড়তি থাকে। এই সময় কৃষকের কাছে আলু থাকে না। পুরোনো আলু তখন বাজারে এসেছে হিমাগার থেকে। অক্টোবর মাসে বেশি বৃষ্টির কারণে আলুবীজ রোপণে দেরি হওয়ায় বাজারে আগাম আলু আসতেও দেরি হয়েছে। এসব কারণে বাজারে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম ছিল, যার সুযোগ নিয়েছেন হিমাগারের মালিকরা। চাহিদার তুলনায় আলুর ঘাটতি থাকার কারণে মজুতদারেরা ইচ্ছামতো দামে হিমাগার থেকে আলু বিক্রি করেছেন। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসনের দিক থেকে হিমাগার পর্যায়ে কোনো তদারকি না থাকায় মজুতদারেরা এভাবে বাড়তি দামে বিক্রি করতে পেরেছেন। (সিন্ডিকেটের কারসাজিতে অস্থির আলুর বাজার, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৩ নভেম্বর, ২০২৪)

গত ১৫ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেছিলেন, "সিন্ডিকেট শনাক্ত এবং ভেঙে দেয়ার চেষ্টা চলছে। আমরা সবার সহযোগিতা চাই। যদি সিন্ডিকেটের বিষয়ে কোনো তথ্য থাকে, কারা দাম বাড়াচ্ছে এবং একচেটিয়া ব্যবসা করছে তা আমাদের জানান। সরকার অবশ্যই এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেবে।"

সিন্ডিকেট সনাক্ত ও ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য ঠিক কোন কাজটা করা হচ্ছে, আদৌ করা হচ্ছে কিনা, তেমন কিছু সরকারের পক্ষ হতে জানানো হয়নি। দেখা যাচ্ছে, সরকার এখনও সে সিন্ডিকেটের খোঁজ পায়নি।

৭.

যা দেখা গেল, শেখ হাসিনার পতন হয়েছে, কিন্তু তার আমলের লুটপাটকারী ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট রয়ে গিয়েছে। ফলে সে সিন্ডিকেট না ভাঙলে কিভাবে স্বল্প আয়ের মানুষ স্বস্তি পাবে না। কিন্তু সরকার একচেটিয়া ব্যবসায়ীগোষ্ঠী মালিকের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না, যেমন কোন পদক্ষেপ নেয়নি শ্রমিকদের মাসের পর মাস মজুরী বকেয়া রাখা গার্মেন্টস মালিকদের বিরুদ্ধে। গণঅভ্যুত্থানের পর আমরা শুরুতেই বলেছিলাম, শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটেছে, কিন্তু ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা, ফ্যাসিবাদ আনে যে পুঁজিবাদী লুটপাটের ব্যবস্থা– তা রয়ে গিয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মুনাফাই ভগবান। দেশের পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় জনগণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নয়, সর্বোচ্চ মুনাফার জন্যই উৎপাদন নীতি ও উৎপাদন পরিচালিত হয়। ফলে মূল্যবৃদ্ধি পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল। মালিকের শোষণের ফলে শ্রমিকসহ জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কমতে থাকে। আয়ের সাথে ব্যয়ের তাল মেলাতে না পারায় জনগণের নাভিশ্বাস উঠে। ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল থাকলে, মূল্যবৃদ্ধির সংকট হতে সাধারণ মানুষের নিস্তার নেই। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়ও সরকার মূল্যবৃদ্ধি খানিকটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। এ দায়িত্ব সরকার অস্বীকার করতে পারেনা। খাদ্যদ্রব্য যাতে জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে, তা দেখার দায়িত্ব সরকারের। ব্যবসায়ীরা যাতে মজুতই করতে না পারে, সিন্ডিকেট গড়ে তুলতে না পারে, সরকারকে তার বাস্তব অবস্থা তৈরি করতে হবে। সেজন্য একটা হচ্ছে সরাসরি মজুতদার ও সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান, আইনের আওতায় আনা। আরেকটি হচ্ছে, পরোক্ষভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ। সরকার নিজে আমদানি করে বাজারে ন্যায্য দামে সরবরাহ বাড়িয়ে, ব্যবসায়ীদের তৈরিকৃত ঐ পণ্যের কৃত্রিম সংকট ভেঙ্গে দিতে পারে, যাতে ব্যবসায়ীরা লোকসানের আশঙ্কায় দাম কমাতে বাধ্য হয়। এজন্য টিসিবির মাধ্যমে চাল, ডাল, চিনি, তেল, পিঁয়াজ এগুলো আমদানি করে ন্যায্যমূল্যে জনগণের কাছে বিক্রি, প্রতি জেলায় টিসিবির কার্যালয় স্থাপন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, সর্বজনীন রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা– এগুলো অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এখনই করতে পারে। আর আমরা মনে করি, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ক্ষেত্রে অন্তত খাদ্যের ক্ষেত্রে পুরো রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে খাদ্যপণ্য উৎপাদন, আমদানি, সরবরাহ ও বন্টনের পুরো ব্যবস্থাটা নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবসায়ীরা। কৃষক অল্প দামে পাইকার, আড়তদার, হিমাগার মালিক, চালকল মালিক, ফড়িয়া এ ধরণের মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ফলে কৃষক ন্যায্যমূল্য পায় না এবং অতিরিক্ত দামে জনগণকে তা কিনতে হয়। যেসব খাদ্যপণ্য আমদানিনির্ভর, তার দামও নির্ভর করে আমদানিকারকদের উপর। সেক্ষেত্রে সরকার সরাসরি কৃষকদের কাছ হতে ন্যায্যমূল্যে সরকারি ক্রয়কেন্দ্র, এজেন্সির মাধ্যমে খাদ্যশস্য কিনে নিবে এবং যেক্ষেত্রে প্রয়োজন বিদেশ থেকে আমদানি করবে এবং সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত বন্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলে সে খাদ্যশস্য বিভিন্ন সরকারি বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে সরাসরি জনগণের কাছে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করবে। এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে, ব্যবসায়ীরা ইচ্ছোমতো কম দামে কৃষকদের কাছ হতে খাদ্যশস্য কিনতে পারবেনা, ইচ্ছেমতো দাম বাড়িয়ে দিতে পারবেনা। এর ফলে একদিকে কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম পাবে, অন্যদিকে জনগণ লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি হতে রেহাই পাবে।

সাম্যবাদ
'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'-এর মুখপত্র

১৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২৫

সংখ্যানুপাতিক নিবার্চনব্যবস্থা কেন চাই

বাংলাদেশের ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড চালিয়েও ছাত্র-জনতার শক্তিকে দমিয়ে রাখতে পারেনি ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার। গত ১৫ বছর ধরে তারা অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়ে, মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করে রাষ্ট্রশক্তির জোরে ক্ষমতাকে টিকিয়ে রেখেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও উন্নয়নের এমন এক বয়ান তারা তৈরি করেছিল– যারাই সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, দাঁড়াতে চেয়েছে তাদেরই স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি তকমা এঁটে দিয়েছে। ক্ষমতার নিরঙ্কুশ চর্চার মধ্য দিয়ে তারা দেশকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে খাদের কিনারে ঠেলে দিয়েছে। প্রত্যেক স্তরে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তাই ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনে স্বাভাবিকভাবেই এসমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠন বা সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা জন্ম দিয়েছে গণমনে।

ইতোমধ্যে অন্তবর্তী সরকার কর্তৃক ১০টি সংস্কার কমিশনও গঠিত হয়েছে। যার মধ্যে নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনও অন্যতম। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের বহুদিকের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত হচ্ছে বর্তমান আসনভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি বদল করে সংখ্যানুপাতিক বা আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতির প্রবর্তন।

বহু বছর ধরে এদেশের বামপন্থী দলগুলোসহ আরও কয়েকটি দল আনুপাতিক পদ্ধতির নির্বাচনব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু খুব একটা আলোচনায় আসেনি। সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থানের পর এখন বিএনপি বাদে প্রায় সব দলই এই পদ্ধতির কথা বলছে। বিষয়টি বাংলাদেশে নতুন হওয়ায় এর পক্ষে বিপক্ষে অনেক আলোচনাই আসছে বিভিন্ন মহল থেকে। আমাদের দেশে বর্তমানে ওয়েস্টমিনিস্টার মডেলে আসনভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়। এ পদ্ধতিকে বলা হয় 'ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট' বা 'এফপিটিপি'। এপদ্ধতিতে যে প্রার্থী বেশি ভোট পায় সেই জেতে। পরাজিত প্রার্থী বা প্রার্থীরা যে সংখ্যক ভোট বা সমর্থন পায় তার কোন মূল্য থাকে না। এ জন্য এ পদ্ধতিকে 'উইনার টেকস অল' বলেও আখ্যায়িত করা হয়। এক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন আসনের মোট ভোটের ক্ষেত্রে কোন প্রার্থী বা দল যদি ৩০/৪০ শতাংশ ভোট পায় আর অন্য প্রার্থীরা বা দলগুলো সবাই মিলে ৬০/৭০ শতাংশ ভোট পায় তাহলেও মোট ভোটের সংখ্যালঘিষ্ঠ ৩০/৪০ শতাংশ ভোট পেয়েও একজন জয়ী হচ্ছে, অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার তাকে সমর্থন করছে না। এভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারের সমর্থন ছাড়াই একজন প্রার্থী বা দল এ পদ্ধতিতে জয়ী হচ্ছে এবং সরকার গঠন করছে। ফলে গণতন্ত্রকে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বলা হলেও আসনভিত্তিক নির্বাচনে শুভঙ্করের ফাঁকি থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নিশ্চিত হচ্ছে না।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বিগত দিনে আপাত অর্থে যে সুষ্ঠু নির্বাচনগুলো হয়েছে সেই পরিসংখ্যানগুলো পর্যালোচনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি ৪১.৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে ২০০টি আসনে জয়লাভ করেছিল, প্রায় সমানসংখ্যক, ৪০.০২ শতাংশ ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল মাত্র ৬২টি আসন। অথচ সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন হলে বিএনপি পেত ১২৩টি আসন আর আওয়ামী লীগ পেত ১২০টি আসন। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৩০টি আসন পেলেও মোট ভোট পেয়েছিল ৪৮.০৪ শতাংশ এবং বিএনপি মাত্র ৩০টি আসনে জয়লাভ করলেও মোট ভোট পেয়েছিল ৩০.২০ শতাংশ। যদি সেই নির্বাচনটি সংখ্যানুপাতিক ভোটের নির্বাচন হতো, তাহলে আওয়ামী লীগ পেত ১৪৭টি আসন এবং বিএনপি পেত ৯০টি আসন। অর্থাৎ ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের কাউকে সাথে নিয়ে কোয়ালিশনের মাধ্যমে সরকার গঠন করতে হতো।

ফলে দেখা যাচ্ছে, বর্তমান পদ্ধতিতে, জনসমর্থনের ব্যবধান খুব বেশি না হলেও, পদ্ধতিগত কারণে আসন সংখ্যায় বিশাল ব্যবধান হয়ে যায়। আর এ কারণেই নির্বাচিত বা ক্ষমতাসীন দল যা খুশি তাই করতে পারে। সেক্ষেত্রে যদি সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হতো তাহলে ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জোটগতভাবে সরকার গঠন করতে পারলেও সংবিধান সংশোধনের জন্য যে সংসদে দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন লাগে– সাধারণ বিবেচনায় তা পেতো না। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আওয়ামী লীগ সংবিধান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানও বাতিল করতে পারতো না। পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে হস্তক্ষেপও সম্ভব হত না। তাই ভবিষ্যতে এ ধরনের সংকটের পুনর্জন্ম রোধ করতে হলে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের বিকল্প নেই।

সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন 'প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন' বা 'পিআর' নামে পরিচিত। সহজ ভাষায় এ পদ্ধতিতে নির্বাচনে মোট ভোটারের যত ভাগ ভোট যে দল পাবে, সেই দল সংসদে, সেই অনুপাতে ততগুলো আসন পাবে। আনুপাতিক নির্বাচনের তিনটি মডেল বর্তমানে প্রচলিত। যথা- ১. বদ্ধ তালিকা ২. মুক্ত তালিকা ৩. মিশ্র পদ্ধতি।

যুক্তরাজ্যের 'ইলেকটোরাল রিফর্ম সোসাইটি'-এর দেওয়া তথ্যমতে, ১০০ এর অধিক দেশ (ইউরোপের যেমন অধিকাংশ দেশই) তাদের নির্বাচনী ব্যবস্থায় কোনো না কোনো আনুপাতিক আসনবিন্যাস ব্যবস্থা ব্যবহার করে। অন্যদিকে বাংলাদেশের মতো আসনভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যবহার হয় পঞ্চাশটির কম দেশে। এগুলো মূলত ব্রিটিশ সিস্টেম থেকে অনুপ্রাণিত ব্যবস্থা; যেমন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, পাকিস্তান ইত্যাদি।

সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি হলো দলীয় তালিকাভিত্তিক আনুপাতিক ব্যবস্থা। এই পদ্ধতি বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, সুইডেন, অস্ট্রিয়া, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, ব্রাজিলের মতো ৭৭টি দেশে ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে দল বা দলীয় প্রার্থীকে দেওয়া ভোট দলের ভোট হিসেবে গণ্য হয়। সব আসনের ভোট গণনা শেষে দলগুলোকে নির্দিষ্টসংখ্যক আসন বণ্টন করা হয়। সংসদে আসন পেতে হলে কোনো দলকে ন্যূনতম কিছু শতাংশ ভোট পেতে হয়। আসনগুলোতে দলের পূর্বনির্ধারিত ক্রমতালিকা অথবা নিজ নিজ আসনে দলের প্রার্থীদের পাওয়া ভোটের শতাংশের ক্রমানুসারে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়।

তবে এতে সব সময় সংসদীয় আসনের সঙ্গে নির্বাচিত সংসদ সদস্যের যোগসূত্র থাকে না। এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এই দুই সমস্যার সমাধানের জন্য আসনভিত্তিক ও দলভিত্তিক ভোটের সমন্বয় ব্যবহার করা হয়

৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

সরেজমিনে পরিদর্শন করে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির অভিযোগ— আইনজীবী আলিফ হত্যার যথাযথ তদন্ত ও বিচার হচ্ছে না

গত ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে জাতীয় প্রেসক্লাবের মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ হলে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম আদালতে আইনজীবী আলিফ হত্যার ঘটনা নিয়ে একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির সদস্য অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, আইনজীবী মানজুর আল মতিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সামিনা লুৎফা নিত্রা, নারীনেত্রী সীমা দত্ত, সত্যজিৎ বিশ্বাস ও রাফিকুজ্জামান ফরিদ।

লিখিত বক্তব্যে তারা বলেন, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ দেখে ও চট্টগ্রামের সচেতন নাগরিকদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে তাদের মনে হয়েছিল যে– আলিফ হত্যাকাণ্ডের মামলা দায়ের, তদন্ত কোনোটিই সঠিক পথে এগোচ্ছে না এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

সর্বদলীয় সভায় বাম গণতান্ত্রিক জোটের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা

গত ৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে প্রধান উপদেষ্টার আহ্বানে সর্বদলীয় সভায় লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাম গণতান্ত্রিক জোট ও 'বাসদ (মার্কসবাদী)'-এর সমন্বয়ক মাসুদ রানা। সেখানে বামজোটের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত দাবি করা হয়।

১. বিজেপি সরকার ও ভারতে অবস্থানকারী পতিত ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা মিলে বাংলাদেশে একটা সাম্প্রদায়িক অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে, গণঅভ্যুত্থানের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা রক্ষা করতে হবে। ভারতের মিথ্যা প্রচারণার বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের কাছে জোরালো, বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে।

২. বাংলাদেশে ভারতের পতাকা অবমাননার যেসব ঘটনা ঘটছে, সেসব বিষয়ে সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে ও পদক্ষেপ নিতে হবে।

৩. আদালতে বিচারককে ডিম নিক্ষেপ, চিন্ময় দাসের আইনজীবীকে আদালতে যেতে না দেওয়ার ঘটনা উভয় দেশের সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠির জন্য উস্কানি হিসেবে কাজ করবে। যে কোন ব্যক্তির ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রাখে। উক্ত ঘটনায় তা লঙ্ঘিত হয়েছে। এ বিষয়েও সরকারের পদক্ষেপ জরুরী। চিন্ময় দাসের গ্রেফতারের পুরো বিষয় সরকারের দিক থেকে স্পষ্ট করতে হবে।

৪. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এলাকা, উপাসনালয়ে নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে। সংখ্যালঘু নির্যাতনের কোনো ঘটনা ঘটলে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫. ভারতসহ অন্যান্য দেশের সাথে চুক্তি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে এবং রামপালসহ জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি বাতিল করতে হবে। সীমান্তে হত্যা বন্ধ, তিস্তাসহ ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে আন্তর্জাতিকভাবে জনমত সংগঠিত করতে হবে।

৬. অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলাপ আলোচনা করে দেশ পরিচালনা করার পরামর্শ বামজোটের পক্ষ থেকে আমরা দিয়েছিলাম। কিন্তু সরকারের এই উদ্যোগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানাই।

সম্পাদক : জয়দীপ ভট্টাচার্য, 'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'-এর পক্ষে মো: শফি উদ্দিন কবির কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন-০২-২২৩৩৫৬৩৭৩। website: www.spbm.org, E-mail: mail@spbm.org